লেইলা আজম
আয়েশা গোওভারনিওর

দি লাইফ অব দি প্রফেট মুহাম্মদ (সা.)

সুলতানা স্বাতী
অনূদিত

প্রতীক

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা নয়

কীভাবে শুরু হলো ১৩
ইসমাইলের বংশধরেরা ২২
জমজমের প্রতিশ্রুতি ২৬
কাবা আক্রমণে হাতির অদ্ভুত আচরণ ৩১
মহানবীর জন্ম ৩৫
হালিমার সাথের সময় ৩৮
এতিম শিশুটির শৈশব ৪২
নবীজির বিবাহ ৪৭
ফেরেশতা জিবরাইলের আগমন ৫২
প্রথম মুসলিম ৫৬
ঝামেলা শুরু ৬১
বিশ্বাসী রাজা ৬৬
কুরাইশদের নিষ্ঠুরতা ৭২
সীমাহীন দুঃখের বছর ৭৭
নৈশ ভ্রমণ ও স্বর্গে আরোহণ ৮১
আকাবার চুক্তি ৮৬
হিজরত ৯০

ইয়াসরিবে আগমন ৯৬
বদর যুদ্ধ ১০১
উহুদ যুদ্ধঃ অবাধ্যতা পরাজয় বয়ে আনে ১০৮
খন্দকের যুদ্ধঃ পরিখা খনন ১১৬
হুদায়বিয়ার সন্ধি ১২৫
ইসলামের দাওয়াত ১৩২
মক্কা বিজয় ১৪১
হুনায়েন যুদ্ধঃ আত্ম-অহংকারের শিক্ষা ১৪৮
তাবুকঃ বিশ্বাসের পরীক্ষা ১৫৪
বিদায় হজ ১৬১
নবী (সা.)-এর মৃত্যু ১৬৭

টীকা ১৭২

প্রকাশকের কথা

শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার এই বইটি আসলে শিশু-কিশোরদের জন্য। যাদের বয়স ১০ থেকে ১৬ বছর, তাদের উপযোগী করেই এটি লেখা হয়েছে। ছোটদের জন্য লেখার ক্ষেত্রে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। এখানে ভাষা যেমন সহজ হতে হয়, তেমনি তথ্যও হতে হয় স্পষ্ট। আর ইতিহাস বা জীবনীগ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে সে সতর্কতা বেড়ে যায় আরও।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজার হাজার জীবনীগ্রন্থ পৃথিবীজুড়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর সবই যে ইতিহাসঘনিষ্ঠ তা হয়তো বলা যাবে না। অনেকগুলোতেই ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গেছে আবেগ ও ভালোবাসা। অন্ধ আবেগ মাঝে মধ্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আর সে কারণেই হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মতো মহামানবের জীবনী বর্ণনাতেও গ্রন্থভেদে দেখা যায় ভিন্নতা। একই তথ্য এককে বইয়ে এককেভাবে লেখা হয়েছে। আসলে জীবনীগ্রন্থ নির্মোহভাবে লেখা দরকার। তথ্যসূত্র এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আর গ্রন্থটি যখন কমবয়েসিদের জন্য রচনা করা হয়, তখন আরো বেশি সতর্ক থাকতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, তাদের জ্ঞানের ভিত্তিটা যেন সত্যের উপরেই গড়ে ওঠে।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি রচিত হয় নবম শতাব্দীতে। সেটির লেখক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার ইবনে খিয়ার। সেই গ্রন্থটি ইতিহাসে 'আস সীরাতুন-নাবাবিয়্যাহ লি ইবনে ইসহাক' নামে পরিচিত। সংক্ষেপে বলা যায় 'সীরাতে ইবনে ইসহাক।' এর আগেও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে বেশকিছু লেখা-লেখি হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ইবনে ইসহাক ছিলেন পারিবারিকভাবেই একজন ইতিহাসবিদ। এই সীরাত (হজরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী) গ্রন্থটি ঠিক কোন সালে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে ইবনে ইসহাকের জীবনকাল থেকে কিছুটা ধারণা করা যায়। ইবনে ইসহাকের জন্ম ৭০৪ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ৮৫ সনে), আর মৃত্যু ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ১৫০ সনে)। এ

থেকে অনেক ইতিহাসবিদের মতে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর ১২৫ থেকে ১৩০ বছর পর তিনি এই সীরাত রচনা করেন। পরবর্তীকালে ইবনে ইসহাক রচিত এই সীরাতগ্রন্থ নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়। ইসলাম বিশেষজ্ঞদের সেই বিতর্ক মূলত ছিল সীরাতগ্রন্থে ইবনে ইসহাক বর্ণিত কিছু হাদিস নিয়ে। তবে সেই সীরাতগ্রন্থের ইতিহাস অংশ নিয়ে কোনোই বিতর্ক ছিল না।

আমাদের এই গ্রন্থটি মূলত ইবনে ইসহাক রচিত সীরাত-এর উপর নির্ভর করেই রচিত। ইবনে ইসহাকের সীরাতের পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম এটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ড. মার্টিন লিংস (পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হন, এবং আবু বকর সিরাজ আদ দ্বীন নাম গ্রহণ করেন)। ড. মার্টিন লিংসের গ্রন্থটি এরই মধ্যে পৃথিবীর ১৭টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এই গ্রন্থটিকেই হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লেখার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থটি অবলম্বনেই ছোটদের জন্য 'দি লাইফ অব দি প্রফেট মুহাম্মদ (সা.)' নামে এই বইটি লেখেন লেইলা আজম ও আয়েশা গোওভারনিওর। এ যাবতকালে ছোটদের জন্য হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইতিহাস নির্ভর ও তথ্যভিত্তিক যত জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে লেইলা আজম ও আয়েশা গোওভারনিওর লেখা এই বইটি প্রথম সারিতে রয়েছে। তাই আমরা যখন শিশু-কিশোরদের উপযোগী একটি সীরাতগ্রন্থ রচনার কথা ভাবলাম, প্রথমেই চিন্তায় এলো এই বইটির কথা।

বইটি লিখতে যেয়ে লেইলা আজম ও আয়েশা গোওভারনিওর ইতিহাস অংশটুকু নিয়েছেন ইবনে ইসহাকের সীরাতগ্রন্থ থেকে। সেই সঙ্গে লেখাকে প্রাণবন্ত ও সুখপাঠ্য করতে প্রাসঙ্গিকভাবেই কোরআনের কিছু আয়াত ও হাদিস যুক্ত করে দিয়েছেন।

অনুবাদগ্রন্থটিতে বেশকিছু প্রাসঙ্গিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো একটি স্থান সম্পর্কিত যে ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো বেশিরভাগই বর্তমান সময়ের। শিশু-কিশোরদের মনে ছবিগুলো বাড়তি আগ্রহ জন্ম দেবে— এমন বিবেচনা থেকেই কাজটি করা হয়েছে। তবে ইসলামি রীতি মান্য করে কোনো ব্যক্তির ছবি বা অবয়ব ব্যবহার করা হয়নি।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমাদের শিশু-কিশোরদের প্রকৃত সত্যটি অবহিত করতে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ জরুরি ছিল বলেই আমাদের ধারণা। সেই বিশ্বাস থেকেই এই বইটি প্রকাশ করা হলো। যদিও বইটি শিশু-কিশোরদের কথাকে মাথায় রেখে প্রকাশ করা হয়েছে, তারপরও এতে পরিবেশিত তথ্য, তার যথার্থতা ও স্পষ্টতার কারণে বড়রাও এ থেকে লাভবান হতে পারবেন।

দি লাইফ
অব দি প্রফেট
মুহাম্মদ (সা.)

কীভাবে শুরু হলো

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত সুমেরীয় শহর উর। উপকূলীয় এই শহরটিতেই ইবরাহিম নামের এক যুবকের বসবাস। এই যুবকই আমাদের প্রিয় নবী হজরত ইবরাহিম (আ.), মুসলিম জাতির পিতা।

উরের লোকজন একসময় এক আল্লাহরই প্রার্থনা করত। কিন্তু সময় যাওয়ার সাথে সাথে তারা সত্য ধর্ম ভুলে গেল। মূর্তি ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা শুরু করল। মূর্তিগুলোও ছিল বিভিন্ন ধরনের। কোনোটা কাঠ দিয়ে তৈরি, কোনোটা আবার মাটি দিয়ে তৈরি। এমনকি অনেক সময় তারা মূল্যবান পাথরকেও পূজা করত।

ইবরাহিম যখন ছোট্ট শিশু, তখনই তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন, তাঁর শহরের লোকজন কেন এই সব মূর্তিকে পূজা করে? বিশেষ করে তাঁর বাবা। তিনি কেন নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করেন? যে মূর্তি তিনি তৈরি করেন, তাদেরই আবার ঈশ্বর বলে ডাকেন! আবার তাদেরই পূজা করেন! পিতার কর্মকাণ্ড ছোট্ট ইবরাহিমের মাথায় কিছুতেই ঢুকত না। তাঁর বাবা ছিলেন মূর্তি নির্মাতা ও রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত।

অথচ ইবরাহিম কখনোই এই সব মূর্তিকে পূজা করতেন না। লোকজন যখন তাঁকে এই সব মূর্তিকে পূজা করতে বলত, তিনি রাজি হতেন না। বদলে শহর ছেড়ে একাকী বসে স্বর্গ-মর্ত্য ও তাঁর নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাঁদের লোকজন ভুল করছে। তাই তিনি একাই সঠিক পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন।

এক রাতে পরিষ্কার-স্বচ্ছ আকাশের নিচে বসে ভাবছিলেন তিনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। এ সময় তিনি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র

দেখতে পেলেন। নক্ষত্রটি এতটাই সুন্দর যে তাঁর চোখে পানি চলে এল। তিনি ওই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'এটা নিশ্চয়ই আমার প্রভু!' যতক্ষণ পর্যন্ত তারাটি বিবর্ণ হতে হতে একসময় হঠাৎ করেই মিলিয়ে না গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শ্রদ্ধার সাথে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর বেশ হতাশ হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'অস্তমিত হয় বা ডুবে যায়, এমন জিনিস আমি ভালোবাসি না। এমন জিনিস আমার প্রভু হতে পারে না!' (কোরআন, সুরা ৬, আল-আনতাম; আয়াত ৭৬)

আরেক রাতে ইবরাহিম আবারও আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এ সময় তিনি উদীয়মান চাঁদকে স্পর্শ করতে পারবেন, ভাবলেন। দেখতে পেলেন চাঁদটা অনেক বড় ও উজ্জ্বল। তাঁর মনে হলো, তিনি ভাবলেন, 'তাহলে এটাই আমার রব।' কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদটিও ডুবে গেল। এরপর তিনি বললেন, 'যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ না দেখায়, তাহলে আমিও অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (কোরআন, সুরা ৬, আল-আনতাম, আয়াত ৭৭)

এরপর সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য দেখলেন ইবরাহিম। সূর্যের প্রখর উজ্জ্বলতা ও প্রচণ্ড দীপ্তি দেখে তিনি সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, 'সূর্য অবশ্যই এই বিশ্বজাহানের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী।'

ভাবলেন, 'তাহলে এটিই আমার প্রতিপালক।' কিন্তু তৃতীয়বারের মতো তিনি ভুল করলেন। দিন শেষে সূর্যও ডুবে গেল। এই ঘটনার পরই তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে আল্লাহ্ সবচেয়ে শক্তিশালী। নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ও সকল জীবন্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনি। হঠাৎ করে তিনি খুব শান্তি অনুভব করলেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, আসল সত্যটা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তখন তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক করো, তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্লিপ্ত।' (কোরআন, সুরা ৬, আল-আনতাম, আয়াত ৭৮)

একদিন তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা করছিল। ওই সময় সেখানে হাজির হলেন ইবরাহিম। সবাইকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কার পূজা করো?'

তারা বলল, 'আমরা মূর্তিদের পূজা করি। সর্বদা তাদের প্রতিই নিবেদিত থাকি।'

ইবরাহিম বললেন, 'তোমরা যখন কাঁদো, তারা কি শুনতে পায়?'

পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন জবাবে বলল, 'না।'

'তারা কি তোমাদের কোনো সুবিধা দিতে পারে কিংবা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?'

'না। কিন্তু আমরা আমাদের পিতা ও তার পিতাদেরও এমনটাই করতে দেখেছি।'

'তোমরা আসলে কার পূজা করছ, তা কি কখনো ভেবে দেখেছ? তোমাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যা করতেন, তা-ই করছ! তোমরা তাদের পূজা কেন করো, যারা কানে শোনে না। চোখে দেখে না। তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না!'

ইবরাহিম আরও বললেন, 'এই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক ছাড়া এই সব মূর্তি আমার শত্রু। আমি তাঁরই ইবাদত করব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখান। তিনিই আমার পানাহারের ব্যবস্থা করেন। যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তিনিই আমার আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা করেন। তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আবার আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শেষ বিচারের দিন, তিনি আমার সমস্ত পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।' (কোরআন, সুরা ২৬, আশ-শুআরা; আয়াত ৭০-৮২)

একদিন এক উৎসবে যোগ দিতে শহরের প্রায় সব লোক বাইরে গেল। বছরের ওই বিশেষ দিনে শহরের বাইরে মেলায় অংশ নিয়েছিল তারা। কিন্তু সেখানে যাননি ইবরাহিম। যদিও তাঁর সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁকে সেখানে যাওয়ার অনুরোধ করেছিল। তিনি তাদের জানিয়ে দেন, তিনি অসুস্থ। আসলে ওই ধরনের মেলা বা উৎসব তাঁর পছন্দ ছিল না।

পুরো শহর ফাঁকা। এটাই সুযোগ মন্দিরে ঢুকে মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার। যেই ভাবা, সেই কাজ। ইবরাহিম গেলেন মন্দিরে। সেখানে অনেক দেবদেবী। রাগে ডান হাতের কুঠার দিয়ে সব মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন তিনি। শুধু সবচেয়ে বড় মূর্তিটাকে না ভেঙে ও রকমই রেখে দিলেন। আর ওই মূর্তিটার হাতে ধরিয়ে দিলেন তাঁর হাতের কুঠারটি!

যথাসময়ে ফিরে এল লোকজন। মন্দিরে পূজা করতে গিয়ে দেবদেবীর এ অবস্থা দেখে রাগে ফেটে পড়ল তারা। মূর্তিগুলো সম্পর্কে ইবরাহিমের করা সমস্ত মন্তব্য মনে পড়ে যায় তাদের। তারা তখন ইবরাহিমকে ডেকে নিয়ে আসে মন্দির চত্বরে। সকলের সামনে তাকে দাঁড় করায়। তারপর রাগান্বিতভাবে প্রশ্ন করে, 'ওহে ইবরাহিম, তুমিই সেই ছেলে, যে আমাদের উপাস্য, আমাদের প্রভুদের সাথে এই কাজ করেছ?'

ইবরাহিম বললেন, 'আমার মনে হয় প্রভুদের দলনেতা এই কাজটি করেছে। একেই জিজ্ঞেস করে দেখো না! ও নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলবে। আর কুঠারটিও ওই বড়টির হাতেই!'

লোকজন উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, 'তুমি জানো তারা কথা বলতে পারে না। তারা নড়াচড়াও করতে পারে না।'

ইবরাহিম ক্ষুব্ধভাবে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের সৃষ্টিকেও তৈরি করেছেন। আর তোমরা কী করছ? নিজেরাই তৈরি করতে পারো, এমন জিনিসকে পূজা করছ?' (কোরআন, সুরা ৩৭, আস-সাফফাত, আয়াত ৯৫-৯৬)

'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে সেজদা করছ, যারা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?' (কোরআন, সুরা ২১, আল-আম্বিয়া, আয়াত ৬৬)

শেষে ইবরাহিম তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে। তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল মূর্তিগুলোরই পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করছ, তারা তোমাদের রিজিকের মালিক নয়। কাজেই একমাত্র আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ করো। তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (কোরআন, সুরা ২৯, আল-আনকাবুত, আয়াত ১৬-১৭)

উরের জনগণ ইবরাহিমের এমন কথা পছন্দ করল না। বরং তাঁকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ও ভয়ংকর শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ইবরাহিমকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে চাইল। ভাবল, এমন শাস্তি দেখলে অন্যরাও তাঁর দলে যোগ দিতে সাহস করবে না। ঠিক হলো, তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে। সেই প্রস্তাব নিয়ে সবাই গেল সে দেশের বাদশাহের কাছে। বাদশাহের মন্ত্রী ও দেশের প্রধান পুরোহিতের ছেলে হওয়ায় তাঁকে সরাসরি আনা হলো বাদশাহের দরবারে।

বাদশাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার উপাস্য কে?'

ইবরাহিম জবাব দিলেন, 'আমার পালনকর্তা, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন।'

দীর্ঘদিন রাজত্ব করায় বাদশাহ নিজেকেই একমাত্র উপাস্য ভেবেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ইবরাহিমও তাঁকে উপাস্য হিসেবে স্বীকার করবে। তাই তিনি বললেন, 'আমিও বাঁচাই ও মারি। মৃত্যুদণ্ডের আসামিকে খালাস দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারি। আবার খালাসের আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি।'

ইবরাহিম বললেন, 'আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দেখান দেখি।'

কাবা আক্রমণে হাতির অদ্ভুত আচরণ

কালক্রমে মক্কা এক গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে ওঠে। সেই সময় ব্যবসাসূত্রে পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়াসহ দূর প্রাচ্যে ছিল আরবদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ওই সময়ই আফ্রিকার দেশ আবিসিনিয়া থেকে যুদ্ধ করতে ইয়েমেনের উপকূলে আসে আবরাহা আল-আশরাম। একজন সাধারণ যোদ্ধা হয়েও পরবর্তী সময়ে ইয়েমেনের দখল নেন তিনি। পরে নিজেকে সেখানকার গভর্নর ঘোষণা করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ করেন, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইয়েমেনের বিভিন্ন অংশ থেকে লোকজন জড়ো হয় মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। শুধু তা-ই নয়, অন্য আরবরাও ওই সময়েই মক্কা ভ্রমণ করে। এর কারণ জানতে চাইলেন তিনি। তাঁকে বলা হলো, কাবাগৃহে তীর্থযাত্রায় মক্কায় যায় তারা।

নিজের দেশের চেয়ে মক্কা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর, তা বুঝতে পেরে হিংসায় জ্বলতে থাকেন আবরাহা। তাই তিনি তার দেশে এক চাকচিক্যময় গির্জা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। গির্জাটি নানা রঙের মার্বেল পাথরে তৈরি করেন। এর দরজা সোনার। হাতলগুলো রুপার তৈরি। লোকজনকে কাবার পরিবর্তে এই গির্জায় আসার নির্দেশ দেন তিনি। কিন্তু সবাই তার নির্দেশ অমান্য করে। বরং মক্কায় তীর্থযাত্রা অব্যাহত রাখে।

এর ফলে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন আবরাহা। কাবাগৃহ ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। প্রস্তুত করে বিশাল এক সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিল হস্তীবাহিনী। শিগগিরই তারা মক্কার দিকে আসতে শুরু করে। মক্কাবাসী যখন শুনতে পেল আবরাহা কাবা আক্রমণ করতে আসছেন, তখন তারা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আবরাহার বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম

নয় মক্কাবাসী। কিন্তু কাবাগৃহ ধ্বংস হতেও দেওয়া যায় না। কীভাবে কাবাগৃহকে রক্ষা করবে তারা?

তখনো কুরাইশদের প্রধান নেতা আবদুল মুত্তালিব। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী। একই সাথে শ্রদ্ধার ও সম্মানের। সবাই মিলে তাঁর কাছেই যায় পরামর্শের জন্য। এরই মধ্যে মক্কার বাইরে এসে পৌঁছায় আবরাহার বাহিনী। মুত্তালিব আবরাহার সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেন। মক্কার সীমানায় প্রবেশের সময় শহরের বাইরে মাঠে বিচরণ করছিল তার উটের পাল। আবরাহা তার সমস্ত উট নিয়ে যান।

শহরের বাইরেই তাঁবু স্থাপন করে আবরাহা বাহিনী। সেখানেই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান মুত্তালিব। তাঁর কথাবার্তা ও আচরণে মুগ্ধ হন আবরাহা। জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? কী চান?'

হস্তীবাহিনীর উপর আবাবিলের আক্রমণ, শিল্পীর কল্পনায় আঁকা চিত্র

উত্তরে মুত্তালিব বলেন, 'আমি আমার দুইশত উট ফেরত চাই।'

এ কথা শুনে ভীষণ অবাক হন আবরাহা। বলেন, 'আপনাদের পবিত্র কাবাগৃহ ধ্বংস করতে এসেছি আমি। ওই কাবাগৃহ তো আপনার পিতা ও তাঁর পূর্বপুরুষদেরও পবিত্র স্থান, তাই না? সেই কাবাগৃহ রক্ষা করতে না চেয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন সামান্য উট চাইতে?'